

ছেলেবেলা ও ছাত্রজীবন

■ আবুল মাল আবদুল মুহিত



ছাত্রজীবনের অবসান

(১৫ ডিসেম্বর চতুর্থ পাতায় প্রকাশের পর)

ছাত্রজীবনের নেতা ফজলুল হক হলের ছাত্র আবদুল মোমেন তালুকদার (তিনি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হন) ছিলেন আমাদের মধ্যে বয়ঃভ্যেষ্ঠ। তাছাড়া আমাদের মধ্যে ছিলেন একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ ছাত্রনেতা সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র আবদুল আউয়াল, ফজলুল হক হলের সহ-সভাপতি এবং ছাত্রলীগ নেতা মনসুর আলী (পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বিএনপির মন্ত্রী), সলিমুল্লাহ হলের সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ নেতা ও সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের পুত্র মাহবুব আনাম, ঢাকা হলের সহ-সভাপতি ছাত্র ইউনিয়নপন্থী নিরোদ নাগ এবং আমি। সারাদিন আমরা খানায় থাকলাম। সেখানে তারাও আমাদের খানাদানা দিলেন এবং আমাদের বন্ধুরাও বাইরে থেকে খানাদানা সরবরাহ করলেন। অপরদিকে আমরা ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারের দিকে রওনা হলাম এবং সন্ধ্যার আগেই আমাদের বন্দীজীবন শুরু হলো। জেল কর্তৃপক্ষ বললেন, আমরা ৭ রাজবন্দী আছি এবং আমাদের জন্য তারা একটি ওয়ার্ডে সবগুলো কামরা খালি করেছেন। মেন্টাল ওয়ার্ড নামে পরিচিত এই এলাকায় আমাদের থাকা-খাওয়ার

ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের ৭ জনের জন্য ৭টি কামরা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আমরা ইচ্ছা করলে ২-৪ কামরায় থাকতে পারি; তবে শর্ত হলো প্রতি কামরায় অন্তত ৩ জনকে থাকতে হবে। আমরা অন্য দু'জন বন্দী যারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন তাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। একজন ছিলেন নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের প্রসিদ্ধ নেতা খান সাহেব ওসমান আলীর পুত্র শামসুজ্জোহা (যিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন), আর অন্যজন ছিলেন জামিল (যিনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জের একজন শ্রমিক নেতা এবং অধ্যক্ষ আবু হেনার এক রকমের নাতি)। আমরা ৯ জন ঠিক করলাম, কামরায় থাকব। মনে রাখা দরকার, তখন ছিল শীতকাল। জেল জীবনের ঋষিভ্রমটি ছিল খুবই অদ্ভুত। সকাল বেলায় আমাদের কামরার তালা খুলে দেয়া হতো। তখন আমরা আমাদের এই নির্দিষ্ট এলাকায় মাঠ, দেয়াল, কামরা এগুলোতে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। আমাদের কাছে যে সীমানা প্রাচীর ছিল তার কাছেই ছিল মৌলবীবাজারের কাঁচারাজার। সুতরাং আমরা বাইরের আওয়াজ শুনতাম এবং তা ভাল লাগত। আমাদের খাওয়া-দাওয়া ছিল সকালে চায়ের সঙ্গে নাস্তা মানে দু'টুকরা পাউরুটি এবং দুপুরে ও রাতে আবার খানা। বলা হলো আমাদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক খরচ ১৩ বা ১৪ আনা নির্দিষ্ট আছে। এ অর্থ দিয়ে কোন সময় সস্তা খানার ব্যবস্থা করতে পারি, যাতে মাঝে মাঝে আমরা ভাল খানা পেতে পারি। যখন জেলে ঢুকি তখন আমরা প্রত্যেকেই আমাদের এ্যাকাউন্টে কিছু টাকা জমা দিয়ে রাখি। এই টাকা দিয়ে আমরা পান, বিড়ি, সিগারেট বরচ করার সামর্থ্য আদায় করি। আমাদের বলা হলো, আমরা চাইলে আমাদের লেখাপড়ার

বইপত্র নিয়ে আসতে পারি। আমি বেশকিছু পাঠ্যবই নিয়ে এলাম। বাস্তবে কিন্তু সেগুলো পড়ার সুযোগ মোটেই পেলাম না। আমাদের গ্রেফতারি পরোয়ানায় দেখানো হয় যে, আমরা এক মাসের জন্য গ্রেফতার হয়েছি, আমরা সবাই ছিলাম সিকিউরিটি বন্দী। আরও বলা হলো, আমরা জেলের নিয়মানুযায়ী সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে আমাদের আত্মীয়-স্বজন বা আপনজনের সঙ্গে দেখা করতে পারি। সেজন্য তাদের জেলগেটে আসতে হবে। আমরা ৯ জন যারা একসঙ্গে ছিলাম তাদের মধ্যে মাত্র একজনেরই জেল বাটার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। সেই ব্যক্তিটি আবদুল আউয়াল। তিনি আমাদের কি কি করতে হবে এবং আমরা কি কি সেবা জেলে বসে পেতে পারি তার একটা ধারণা দিলেন। তিনি আরও বললেন, আমরা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের সেবা পাব, তারা আমাদের রান্নাবান্না করবে, বাসনপত্র ধোয়া-মোছা করবে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে দিতে পারে। এদের বলা হতো ফালতো। জেলের সব খানা-দানায় একটি গন্ধ পাওয়া যেত, যা লাইসল অথবা ন্যাপথলিনের গন্ধের মতো মনে হতো। তিনিও বিষয়ে আমার খুবই আপত্তি ছিল। প্রথমটি হলো বন্দিভূ। চার দেয়ালের মধ্যে আটকে থাকা একবারে অসহ্য আর বিশেষ করে যখন সেটা কেউ বিধি-নিষেধ আশেপাশ করেছে বলে। এমনি হয়তো দিনের পর দিন কাটিয়ে দিছি বাড়িতে বসে, বাইরে কোথাও যাছি না। কিন্তু সেটা নিয়ে ভাবছি না সহনীয় বলে, বেরুতে পারবো না বলে যে নিষেধাজ্ঞা সেটাই হলো আপত্তিকর। দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল এক ধরনের উন্মুক্ত গোসলখানার ব্যবস্থা। খোলা কলের পানিতে গোসল করা বা হাত-মুখ ধোয়া করতে হতো। গোসলখানায় কোন পর্দার বলাই ছিল না। তৃতীয়ত ছিল রাতের বেলায় মলমূত্র ড্যাগের ব্যবস্থা। প্রতিটি কামরায় ছিল একটি কাটা টিন বা কাটা ড্রামের ভাঙ। সেই পাত্রেই সব কাজ সারতে হতো। এক টুকরা চট টানিয়ে দিয়ে সেখানে ছিল প্রাইভেসির ব্যবস্থা যা মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না।

চলবে...